অচেনা গাড়োয়াল

সুমিত চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

লেখক পেশায় অর্থনীতির মানুষ হলেও ভালো বাসেন ঘুরে বেড়াতে। আর সেই ঘুরে বেড়ানো থেকে তুলে যান জীবনের নানা মুহূর্তের ছবি। এমনি ছিল তাঁর অনেক ঘোরার মধ্যে একটা হিমালয়ের বুকে প্রায় অজানা দুই বুগিয়ালে ঘোরা। লেখক নিজের সেই অসাধারণ ভ্রমণ কথা ভাগ করে নিলেন সকলের সঙ্গে। হয়ত আগামী দিনে এমনি আসবে আর নানা জায়গায় বেড়ানোর ebook, আশা করা যায় কেদারনাথের কপাট বন্ধের বিস্তারিত কাহিনীও তার মুখ থেকে শুনতে পাব।

নাওয়ালি বুগিয়াল

রবিবার মানে আমার কাছে "ল্যাদ ডে"। সারা সপ্তাহের অফিসের ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার একটাই উপায়। যতটা সম্ভব ল্যাদ খেয়ে নাও। এরকমই একটা রবিবার সোফায় পরে ল্যাদ খাচ্ছি, এমন সময় বিলাসদার (Avi Chatterjee) ফোন - "নাওয়ালি বুগিয়াল যাবি"? প্রথমে ভাবলাম হিব্রু বলছে বোধয়। এতদিন পাহাড়ে যাচ্ছি, এরকম কোন ট্রেকের কথা আগে তো শুনিনি।

বিলাসদার সাথে আলাপ হয়েছিল ১৯৯৭ সালে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প যাওয়ার সময়। বর্ধমানে থাকে, তাতে কি? আমার যাকে একবার ভাল লেগে যায় তাকে কিছুতেই ছাড়তে পারব না। সেই থেকে সানাই এর পোঁ হয়ে থেকে গেছি। যদিও বিলাসদার দৌড় অনেক দূর। বর্ধমানের ভ্রম্মনিক নামে একটা মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সক্রিয় সদস্য। এখনো নিয়মিত বড় বড় অভিযানে যায় কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য টানে মাঝে মাঝে আমায় নিয়ে টানাটানি করে ছোটখাটো ট্রেক করতে গেলে।

যাই হোক কানটা একটু কচলে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম "কি বললে, আর একবার বলো, বুঝতে পারলাম না"। এবার বুঝলাম ঠিকই শুনেছি - "নাওয়ালি বুগিয়াল"' সঙ্গে এবার আর একটা নাম জুড়ে দিলো "বাগজি বুগিয়াল"। বুঝলাম নির্ঘাত কোনো গাইডের কাছ থেকে নতুন কোনো রুটের খবর পেয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম কোথায় এটা। এবার আরো অবাক হওয়ার পালা। বললো "আমিও

ঠিক জানিনা, দেবল থেকে কোথায় একটা গিয়ে তারপর হাঁটা। চার দিনে দুটো বুগিয়াল পার হয়ে কোন একটা গ্রামে পৌঁছতে হবে।" বোঝ ঠ্যালা, একটাই Constant "দেবল" ব্র্যাকেটের বাইরে। বাকি সব Variable ব্র্যাকেটের ভেতর। এরকম সিম্পলিফিকেশনের অংক আমি বাপের জন্মে করিনি। মোদ্দা কথা হলো এই যে যেহেতু বিলাসদা হিন্দিটা প্রায় বাংলায় বলে তাই আমায় জয়বীর কে ফোন করে বিস্তারিত জানতে হবে।

অগত্যা জয়বীর কে তৎক্ষণাৎ ফোন। শুনে যা বুঝলাম এটা কোনো প্রচলিত ট্রেক রুট নয়। মেষপালকরা এই সব রাস্তা দিয়ে ভেড়া ছাগল নিয়ে বুগিয়ালে চরাতে যায়। বছরের পর বছর যাতায়াত করে করে একটা পথের সৃষ্টি হয়েছে। উফঃ, শুনেই কেমন মেতে গেলাম। অজানা গন্তব্য, সভ্য মানুষের বিচরণ নেই, গদ্দিয়ালাদের সাথে একই জায়গায় থাকা। ভাবা যাচ্ছে না।

রুট টা হল, দেবল থেকে সাওয়ার গ্রাম ২২ কিলোমিটার যাব গাড়িতে। ওখান থেকে প্রথম দিনের হাঁটা ৭ কিলোমিটার - কাচনি থ্যাচ। পরদিন আরো ৮ কিলোমিটার নাওয়ালি বুগিয়াল। তৃতীয় দিন নাওয়ালি থেকে পৌঁছব বাগজি বুগিয়াল আরো ৮-৯ কিলোমিটার আর শেষ দিন প্রায় ১০ কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছব ঘেস গ্রাম। ওখান থেকে দেবল ৫৬ কিলোমিটার ফিরব গাড়িতে।

ঠিক হল জয়বীর সব ব্যবস্থা করে রাখবে। আমরা দেবল পোঁছে ওর সাথে দেখা করব।

সপ্তমীর সকাল। ভোর বেলায় ঘুম ভাঙল নবপত্রিকা স্নানের শোভাযাত্রার ঢাকের আওয়াজে। মাঁ তো প্রত্যেকবার এই সময়

বাপের বাড়ি আসেন। তাই এই কদিন বাবাকে একা পাওয়া যায়। সেই সুযোগটা কাজে লাগাতেই ওনার ঠেক গুলোয় একটু পৌঁছবার চেষ্টা করি এই সময়। কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে পরদিন সন্ধ্যে বেলায় হারিদ্বার। রাত্তিরটা কাটিয়ে পরদিন জয়বীরের পরিচিত ড্রাইভার আমাদের দেবল পৌঁছে দিল বিকেলের মধ্যে।

আমাদের দলে বিলাসদা (Avi Chatterjee) ছাড়া আছে বনানী (Banani - আমার বেস্ট হাফ), গাঙ্গি (আমার মেয়ে) আর স্যার (Sukamal Ray)। স্যারের কথা একটু বলে নিই। ওনার সাথেও আলাপ হয়েছিল ১৯৯৭ সালে নেপালে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের পথে। একা মানুষ, একেবারে স্বত্ত্বিক। আমার সাথে যোগাযোগটা তার পর থেকেই রয়ে গেছে। মানিকতলা হাই স্কুলের হেডমাস্টার পদে ছিলেন। বছর দশেক হল অবসরপ্রাপ্ত। প্রায় জোর করেই নিয়ে এসেছিলাম এইবার কারন স্যার কে দেখে আলাদা অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। এই বয়েসেও দিব্বি পাহাড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন আমাদের সাথে।

তবে এটাই স্যারের আপাতত শেষ ট্রেক ছিল। বুঝতে পারছিলাম বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তাই ঠিক করেছিলাম বুড়োটাকে আর হাঁটাব না।

রাত্তিরে GMVNএ ডিমের ডালনা আর রুটি খেয়ে সুখনিদ্রা। ভোরে উঠে বারান্দায় আসতেই দেখি ঝলমলে রোদে ভেসে যাচ্ছে মৃগথুনির বরফের দেওয়াল। ছোট্ট জনপদ দেবল। শেষবার এসেছিলাম ১৯৯৬ সালে রূপকুন্ড যাওয়ার সময়। সব মনে পরে যাচ্ছিল। এখান থেকেই তো সব রেশন তুলেছিলাম সেবার। এখন অবশ্য ওসব ঝামেলা নেই। জয়বীর সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

তৈরি হয়ে নিচে এসে দেখলাম জয়বীর সঙ্গে আর একজনকে নিয়ে এসে গেছে। গাড়িতে মাল পত্তর তুলছে। দেখেই এক মুখ হেঁসে বলল "গুড মর্নিং দাদা, घंटे भर में निकलेंगे, खचारवाला सीधा सवाडं गांव पहोच जाएंगे।" তাহলে এক ঘন্টা পরে কেন বেরবো? জানলাম একজন মালবাহক মুন্ডলি থেকে এসে পৌঁছায়নি। সেই হেতু অপেক্ষা।

বেরোতে বেরোতে নটা বেজে গেলো। ২২ কিলোমিটার রাস্তা যেতে মিনিট চল্লিস লাগল। রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে ওখান থেকে সাওয়ার গ্রামটা কিছুটা উপরে। আমরা একটা শিবমন্দিরের পাস দিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে এগোতে শুরু করলাম। যাওয়ার পথে দেখতে পাচ্ছি আশপাশের ঝুমচাষের মাঠে মেয়েরা কাজ করছে। দুটো ভুতো আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। বেশ গায়ে গতরে পাহাড়ি কুকুর, আমার ভাষায় ডগেন্দ্র অথবা পাহাড়ি বলে ডগেস্বরানন্দ বলা যেতে পারে। কিছুক্ষনের মধ্যে পৌঁছে গেলাম গ্রামে। একটা ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। দেখি গোটা উঠোনে রামদানা ছড়ানো রয়েছে আর দুজন মহিলা আমাদের সাথে কথা বলতে বলতে দিব্বি সেগুলোর

ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে দোলছে। বুঝলাম এইভাবেই রামদানার আটা বানানো হয়। খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা। ব্যাস আর কোনো রাস্তা নেই। কিছুটা পথ ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর একটা জঙ্গল। ভাবলাম, যাক অন্তত রুদ্দুর থেকে মুক্তি। একটু পড়ে বুঝতে পারলাম মুক্তি নয় অভিশাপ। একে তো রাস্তা বলে কিছু নেই তার ওপর একটা বিকট প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ডিগ্রি ঢাল উঠে গেছে আর গোদের ওপর বিষ ফোরার মতো পৃথিবীর যত নুড়ি পাথর আছে, সব এনে এইখানে ফেলেছে। আমি কিছুটা পিছন থেকে যখন স্যারকে চোখে রেখে উঠছি তো দেখি বিলাসদা একটা অন্য দিকে যাচ্ছে। আবার জয়বীর চলমান অসরীরীর মতো সরাসরি সোজা উঠে চলেছে। এই সব রাস্তায় সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হল ওপরে না দেখে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটো আর মাঝে মাঝে ওপরে তাকিয়ে একদম সামনের লোকটাকে দেখে নাও। এরকম প্রায় ঘন্টা দুয়েক চলার পর একটা পথ জাতীয় কিছু পাওয়া গেল। আসলে ওটা জল নামার রাস্তা। বর্ষার সময় এই রাস্তাগুলোই ঝোরার আকার ন্যায়। এবার সেই ঝোরার পথ ধরে সামনের পাহাড়টার মাথায় পৌঁছতে হবে। নতুন উদ্যম নিয়ে চলা শুরু। ওমা... দেখো কি কান্ড। আমাদের তো আজ মাথায় উঠতেই হলনা। কিছুটা আগেই হঠাৎ বাঁদিক থেকে শুনতে পেলাম "এদিকে চলে আয়"। বিলাসদার গলা, কিন্তু বাঁদিকে তো একটা পাথরের দেওয়াল আর তার ওপাশে ঝোপঝাড়। এবার বললো "সামনে এগিয়ে যা। একটা ফাঁক আছে। ওখান দিয়ে চলে আয়"। হ্যাঁ, ঠিক তাই। একটু এগিয়েই পাথরের দেওয়ালটার মাঝে একটা তিন ফুট মত খোলা জায়গা। ঢুকে গেলাম সেখান দিয়ে।

বাঃ! একটা ছোট সবুজ ঘাসে মোরা মাঠ আর দুটো ঘর। মাঠে আমাদের তাঁবু খাটানো হয়েছে আর একটা ঘর হবে আমাদের আজকের কিচেন টেন্ট। পাথরের ঘর দুটো হল গদ্দিয়ালাদের। আশপাশে তাদের ভেড়াগুলো বিচরণ করছে। বিকেলের আলোয় ত্রিশূল কে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অপরূপ সেই দৃশ্য, হিমালয়ের কোলে ওঁ নমঃ শিবায় স্মরণ করতে করতে সন্ধ্যে নেমে এলো....

(প্রথম দুটো ছবি তোলা সাওয়ার গ্রামে, তৃতীয় ছবিটা নুড়ি পাথরে ভরা ঝোরার পথে কাচনি থ্যাচের পথে)

সওয়ার গ্রামের কন্যা

রামদানা গুঁড়ো করছেন মহিলারা

কাচনি থাচের পথে ঝোরার রাস্তা

পাহাড়ে রাত্তিরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি বলে বোধয় ভোর বেলায় তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যায়। তাছাড়া এমনিতেই যত বেলা বাড়ে তত রোদ্দুরের তেজ বাড়ে, তাই যত তাড়াতাড়ি বেরোনো যায় ততই ভালো। আবার ট্রেকের দ্বিতীয় দিনেই একটা নতুন গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার উত্তেজনা তো আছেই। বাইরে এসে দেখি আলো বেশ ভালোই ফুটে গেছে কিন্তু ঘর দুটো কোথায় গেলো? এরকম ধোঁয়াশা কেন? কুড়ি ফুট দূরত্বে ওই ঘর দুটোও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একে একে সবাই বাইরে এসে চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছি কখন একটু পরিষ্কার হবে। আগের দিন সন্ধে বেলায় বাবা ত্রিশূল দেখিয়েছেন, আজও নিশ্চই নিরাস করবেন না। বলতে বলতে মেঘ কেটে যেতে শুরু করল। গাছের ফাক দিয়ে উঁকি মারছে নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, মৃগথুনী। আলো আঁধারীর মধ্যে একটা মায়াময় পরিবেশ।

নাওয়ালি বুগিয়াল থেকে দেখা সূর্যোদয়। সামনে নন্দাঘুনটি, ত্রিশূল, মৃগথুনি

নাওয়ালি বুগিয়ালে জলাশয়

নাওয়ালি বুগিয়ালের সুবুজের ঢেউ

রুটি আর আলুর তরকারি দিয়ে জলখাবার সেরে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুটা পাথরের নুড়ি ভরা ঝোরার পথ দিয়ে এখনো উঠতে হবে। মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌঁছে গেলাম প্রায় পাহাড়ের মাথায় একটা জঙ্গলের মধ্যে। যাক বাবা, এতক্ষনে পাথরে ভরা রাস্তা শেষ হয়েছে। সূর্যদেব উঠেছেন কিন্তু দেখা দিচ্ছেন না কিছুতেই। একটা কুয়াশার মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে হাটতে দারুন লাগছিলো কিন্তু যেহেতু কোনো সঠিক রাস্তা নেই তাই সামনের জন কে চোখে রেখে এগোতে হচ্ছিলো। একটু পিছিয়ে পড়লেই চাপ। ব্যাস সব ধোঁয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। ডাক দিয়ে গলার আওয়াজ শুনে দিক নির্ণয় করা ছাড়া গতি নেই। বেশ ঘন জঙ্গল, কোনো কোনো জায়গায় তো এমনিতেই সূর্যের আলো ঢোকে বলে মনে হয়না। গাছের কান্ড গুলোই দেখা যাচ্ছে না, বৃষ্টির জল পড়ে পড়ে শেওলার মোটা আস্তরণ পরে গেছে, তারই মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় গাছের ফাক দিয়ে সূর্যের আলো পড়ে সোনালী রং ঝিকমিক করছে। এই ভাবে ঝরা পাতা, বুনো ঘাস আর ভেজা মাটির পথ ধরে জঙ্গলটা পেরোচ্ছি, হঠাৎ এক জায়গায় এসে গাছ কমে এলো। বুঝলাম আমরা প্রায় পাহাড়টার মাথায় উঠে এসেছি। এখান থেকে হালকা একটা ঢাল ওপরে উঠে গেছে আর যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেটা একটা গিরিশিরার মাথা। আস্তে আস্তে একে একে সবাই উঠে এলাম।

আরিব্বাস, ওপর প্রান্তটা তো সবুজের গালিচা।

না, এটা নাওয়ালী বুগিয়াল নয়। জয়বির বললো এখান থেকে শুরু, শেষ হয়েছে প্রায় আরও চার পাঁচ কিলোমিটার পর। আমরা আজ টেন্ট পিচ করবো একদম শেষ প্রান্তে গিয়ে। শুরুর দিকে ঘাসের

জমির মধ্যে একটু আধটু নেড়া মাথা আর মোরগের ঝুটির মতো গজিয়ে ওঠা ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছিলো কিন্তু যত এগোচ্ছি ততই সুবুজ, ঘন থেকে আরও ঘন হচ্ছে। ছবিতে বালিয়াড়ি (স্যান্ড ডিউন্স) দেখেছি কিন্তু এরকম সুদূর প্রান্তর জুড়ে সবুজয়াড়ি দেখিনি। রূপকুন্ড যাওয়ার সময় বেদনী বুগিয়াল বা আলি বুগিয়াল দেখেছি কিন্ত সে তো পাহাড়ের ওপর মাঠের মতো বা কোনো কোনো জায়গায় কিছুটা ঢালের মধ্যে বুগিয়াল কিন্তু এতো যেন ঢেউ খেলানো পর্বত মন্থন।

নাওয়ালি বুগিয়ালে ক্যাম্পসাইট

আমরা হাঁটতে থাকলাম, কখনো সবুজ ঢেউয়ের ওপর উঠছি আবার পরক্ষনেই নেমে যাচ্ছি। চলার পথে বাঁদিকে কোনাকুনি তাকালেই দেখতে পাচ্ছি নন্দাঘুন্টি, ত্রিশুল আর মৃগথুনী দিয়ে গাঁথা পর্বতমালা। এই চলার মজাই আলাদা, রবিঠাকুরের গানের কলির সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে যে -

ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি, বনের পথে যেতে....

ফুলের গন্ধে চকম লেগে উঠেছে মন মেতে...

জড়িয়ে আছে আনন্দেরই গান,

বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার প্রাণ

এই ভাবে ঘন্টা দুয়েক চলার পর এক জায়গায় বেশ বড় বড় ঢেউ। জয়বিররা আমাদের ছেড়ে এগিয়ে গেছে। তারমানে ক্যাম্প সাইটের কাছাকাছি এসে গেছি কিন্তু কোন গলিতে ঢুকবো বুঝে উঠতে পারছি না। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে চারজনে আলোচনা করছে। আমি যথারীতি পিছন থেকে এসে ব্যাপারটা দেখেই ভয় পেয়েছি। এই বুঝি বিলাসদা আমায় রাস্তা খুঁজতে পাঠায়। ভয় পাওয়ার করণ হল, এর আগেও যেখানেই কোনো কনফিউশন হয়, সেখানেই আমাকে সব চেয়ে পাহাড় প্রতিম মানুষ মনে করে। বেগতিক দেখে আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কি ব্যাস, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি পেছন থেকে আওয়াজ - "সুমিত, তুই এক কাজ কর, ওই দুটো ঢিপির মাঝখান দিয়ে ওপরটায় উঠে একটু দ্যাখ, আমি এপাশটা দেখছি।" শুনতে খারাপ লাগলেও, বিলাসদার নির্দেশ গুলো পালন করতে বেশ ভালোই লাগে কারণ এগুলোর মধ্যে পাহাড়ে চলার নিয়ম, নীতি আর শাসন লুকিয়ে থাকে যা থেকে প্রতিনিয়ত শিক্ষা লাভ করি।

চিচিং ফাক অবশ্য আমারি হয়েছিল। একটা ছোট ঢাল পেরিয়ে মেজো ঢাল টার ওপর উঠতেই চোখে পরে গেল একটা বিশাল

কচ্ছপের পিঠের মত বড় ঢালের ওপর আমাদের দুটো টেন্ট। চিৎকার করে ডাক দিলাম বাকিদের, "এদিকেই চলে এসো, পৌঁছে গেছি"

আজকের মতো এখানেই ইতি

নাওয়ালি বুগিয়ালের ঘাসের উপর সবে শরীরটা এলিয়ে দিয়েছি। কিচেন টেন্টের থেকে যতবার প্রেসার কুকারের সিটি বাজছে ততবারই একটা চলে ডালে মেশানো চেনা গন্ধ নাকে ভেসে আসছে আর ততই খিদে বাড়ছে। ওদিক থেকে বিলাসদা এসে বললো খিচুড়ি সবে বসেছে। এখনো দেরি আছে খেতে। এই সময় এরকম শুনলে কার মাথার ঠিক থাকে? পরক্ষণেই বললো পকরা হচ্ছে। ততক্ষণ এটা দিয়ে কাজ চলতে হবে। আরেববাস... কাজ চালানোর জন্য পকরা □। ভাবা যাচ্ছে না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জয়বীর প্রথম খেপের পকরা নিয়ে এলো। ব্যাস... ভ্যানিশ... নিমেষের মধ্যে শেষ। যেন সাত জন্ম খেতে পাইনি কেউ। আলু পিঁয়াজ আর ব্যাসন দিয়ে

মাখিয়ে বেশ মচমচে করে ভাজা। দুপুরের মিঠে রোদে প্রকৃতির কোলে হেলান দিয়ে ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় এরকম জন মানবহীন বুগিয়ালের মাঝে বসে পকরার কথা কস্মিনকালেও ভাবিনি।

বলার উদ্দেশ্য হল এই যে আজকাল বিভিন্ন নামি দামি তথাকথিত ট্যুর বা ট্রেক অর্গানাইজার ট্রেকিং ব্যাপারটা কে একটা luxuryর পর্যায় নিয়ে গেছে যেখানে ফেলো কড়ি মাখো তেল কনসেপ্ট চলে। তাই জয়বীরদের নিজেদের অস্তিত্ব আর রুজি বাঁচাতে ওদের সাথে এইভাবে পাল্লা দিতে হয়। যাই হোক এই ভাবে বেশ কয়েক দফা গরম গরম পকরা দিয়ে মুখ চালিয়ে আর চারিধারটা ঘুরে বেরিয়ে দুপুরটা ভালোই কাটলো।

যখন নাওয়ালি বুগিয়ালের ক্যাম্প সাইট পৌঁছেছি তখন চারিদিকে মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। মনের মধ্যে একটা ভয় ছিল, মেঘ কেটে যাবে তো? সন্ধ্যের পর থেকে বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া করে টেন্টের বাইরে এসে আকাশময় তারা গিজগিজ করছে দেখে মনের ভিতর পুলক জেগে উঠেছিল। সামনের দিকে তাকিয়ে নান্দাঘুনটি ত্রিশূলের অবয়ব বোঝার চেষ্টা করছিলাম কিন্ত কিছুই বুঝতে পারা গেল না।

ভোর হওয়ার আগে বাইরে বেরিয়ে যা দেখলাম সেটা লিখে বর্ননা করা যায়না। শুধু ধ্যানমগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকা।

এরপর বাগজি বুগিয়াল

"আকাশ, নদী, রামধনু, রোদ চললো দিনের শেষে -

এসব যেন সত্যি না হয় মেষপালকের দেশে"

বাগজি বুগিয়াল

প্রাতরাশ সেরে নাওয়ালি বুগিয়াল থেকে রওনা হয়েছি সেই সকাল বেলায়। গন্তব্য বাগজি বুগিয়াল।

নাওয়ালির ক্যাম্প সাইট থেকে বাগজি বুগিয়ালের মাথাটা দেখা যায় তাই মোটামুটি আন্দাজ করা যায় কোথায় যেতে হবে।

হাঁটা শুরু হওয়ার পর থেকেই বুঝতে পারছি আজ কপালে দুর্ভোগ আছে। সেই থেকে নামছি তো নামছি। নামার আর শেষ নেই। একে অপ্রচলিত ট্রেক রুট, তার ওপর আবার মেসপালকদের যাতায়াতের রাস্তা। আগে থেকে কোনো চড়াই উৎরাইএর ধারণা নেই। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। টানা প্রায় ঘন্টা তিনেক ধরে নামছি আর

ভাবছি, আবার উঠতে হবে সেই বগজির মাথায়। মাথা কি আর এমনি এমনি গরম হয়?

জঙ্গলের রাস্তা, থুড়ি রাস্তা বলা ভুল হবে, ঝুরো পাতা ভরা ঢাল। কখনো এই গাছের ডালের নিচ দিয়ে তো আবার কখনো গাছের ডাল টপকে। আবার কখনো শুকনো পাতার নীচে ভিজে মাটিতে কিছুটা হরকে যাওয়া।

অবশেষে এই সুন্দর ঝিলের ধরে এসে পৌঁছলাম। মনটা ভরে উঠল। নতুন দম সংগ্রহ করে নিলাম বাগজি বুগিয়ালের চড়াই ভাঙার জন্য।

এই ভাবেই বোধয় বার বার কষ্ট হওয়ার পরও আবার সব পেয়েছির দেশে কিছু পাওয়া যায়। তাই জানতে পারি কষ্টের শেষে কি আছে? যার টানে বার বার ছুটে যাই

গতকাল বাগজি বুগিয়াল পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর আড়াইটে বেজে গিয়েছিল। একটু হাত পা ছড়িয়ে বসেছি কি প্রকৃতির মুখ ভার। বলা নেই কয়া নেই হঠাৎ কোথা থেকে হাজার হাজার টন মেঘ উড়ে এসে

জুড়ে বসলো। প্রথমে গুড়িগুড়ি... তারপর ঝিরিঝিরি... বলতে বলতে ঝমাঝম। ব্যাস হয়ে গেল প্রকৃতির কোলে এলিয়ে থাকা। সটাং তাঁবুর ভিতর। ক্রমে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম যে বাইরে ঝমাঝম শব্দটা পাল্টে গিয়ে তখন তাঁবুর কেনোপির উপর একটা ফরফর ফরফর শব্দ হচ্ছে। মানে সাবুদানার মতো বরফ পরতে শুরু করেছে আর সেটা চললো প্রায় ৪০-৪৫ মিনিট।

তাঁবুর চেন খুলে বাইরেটা ভারী সুন্দর দেখতে লাগছিলো। বরফ পড়া থেমে গেলেও বৃষ্টিটা চললো আরো কিছুক্ষন। তারই মধ্যে মেসপালকদের ভেড়াগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছিল আর আমাদের দুটো খচ্চরও গায়ে প্লাস্টিক পরে ওই বৃষ্টির মধ্যে দিব্বি ঘাস খেয়ে চলেছে। কোনো বিকার নেই।

বৃষ্টি যখন থামল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে তাই জায়গাটা যে কেমন সেটা ঠাওর করে উঠতে পারিনি।

বুঝলাম পরদিন ভোর বেলায়।

সারারাত ধরে মাঝে মাঝেই গদ্দিয়ালাদের কুকুরগুলো চেঁচিয়ে উঠছিল। কে জানে কোনো হিংস্র জানোয়ার আশপাশে উঁকি ঝুঁকি মারছিল কিনা। চুলোয় যাক। তারই মধ্যে জোর করে যতটা সম্ভোম ঘুমিয়ে নিলাম।

ভোর বেলা চোখ কচলে তাঁবুর চেন টেনে বাইরেটা দেখেই সব অলস্যতা কেটে গেল। সবে সুর্যের প্রথম আলোর ছটা পড়েছে বাগজি বুগিয়ালের ভিজে ঘাসে। আর সেই থেকে চিকমিক করছে সোনালী ঝলক। বাইরে বেরিয়ে চারদিকটা দেখে বুঝতে পারলাম সত্যিই

দেবতাদের বাসস্থানে ছিলাম। ঘাসে মোরা একটা সবুজের চেয়ে বেশি সবুজ উপত্যকা। চারিদিকে ওক আর পাইনের জঙ্গলে ঘেরা। এদিক ওদিক কয়েকটা নিচু জায়গায় গতকালের বৃষ্টির জল জমে জলাধার তৈরি হয়েছে। তারই একপ্রান্তে আমাদের তিনটে তাঁবু। ভেড়াগুলো সকালের রোদে সমবেত হয়ে মিটিং করছে আর তাদের পাহারাদার কুকুর তিনটে রাতের ডিউটি শেষ করে রোদে বসে ঝিমছে। উফঃ চোখের সামনে এখনো সব ভাসছে।

ছবিটা তুলেছি বাগজি বুগিয়ালের একদম মাথার উপর উঠে এসে। আমার বর্ণনার সাথে কতটা মিলছে জানি না। কথায় আছে চোখ অনেক সময় অনেক কিছু দেখতে পায়না যা ক্যামেরার চোখ দেখতে পায়।

দুঃখের Scene মাইরি

চার ছয় মাস ধরে প্রস্তুতি, গাইডের সাথে যোগাযোগ, হাঁটার রাস্তার খোঁজ খবর ইত্যাদি, সব চার পাঁচ দিনে শেষ।

আজ সকালে বাগজি বুগিয়াল থেকে বেরোনোর আগে চারদিকটা ঘুরছিলাম। মনে হচ্ছিল আমরা কোনো রাজবাড়ীর বাসিন্দা যারা নাকি দেবস্থানে থাকি আর তাঁবু গুলো আমাদের রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের বাইরে পা রাখলে সবুজ গালিচার মতো প্রাকৃতিক বাগান। ওই সময় নিজের মধ্যে কেমন একটা রাজা রাজা ভাব ফুটে ওঠে। হাঁটা চলার মধ্যে একটা অদ্ভুত গাম্ভীর্য ভরা তৃপ্তি। সবটাই কল্পনা নয় কিন্তু। যতদূর চোখ যায়, ত্রিসীমানায় যখন আমরা কজন ছাড়া আর কোনো মানুষ দেখতে পাওয়া যায়না তখন অনুভূতিটা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়

আর ততদিন স্থায়ী হয়ে থাকে যতদিন না আবার ইট কাঠের বালুস্তূপের মধ্যে এসে পড়ছি।

বাগজি বুগিয়ালের মাথায় উঠতে উঠতে ভাবছিলাম, আজই তো রাজা সাজার পালা শেষ। তাই যতটা সম্ভব রাজত্ব উপভোগ করে নিলাম বুগিয়ালের মাথায় পৌঁছে। ৩৬০° জুড়ে তখন আমাদের রাজত্ব। সামনে দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে নান্দাঘুনটি, ত্রিশূল আর মৃগথুনি। খচ্চর গুলো তখন আমাদের ঘোড়া আর গাইড পোর্টার রা রাজবাড়ীর মন্দিরের দেবতা। তাঁদের দেওয়া সেদিনের সকালের ভোগ খাওয়া শেষ করলাম। আর শেষপাতে চোখ দিয়ে চেটেপুটে খেয়ে নিলাম সামনের তুষার রাজ্যের আইসক্রিম।

যেদিক দিয়ে ওপরে উঠে এসেছিলাম সেদিকটা ছিল সবুজ গালিচা মোরা আর নামার দিকটায় যেন অজস্র ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে।

কবিগুরুর গানের কলি যেন এমনিই প্রকৃতির মাঝে বাজছে -

ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি, বনের পথে যেতে,

ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে

জড়িয়ে আছে আনন্দের এই গান

বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান....

বনের পথে ঢোকার আগে পর্যন্ত এরকমই পথ দিয়ে নামলাম।

উফঃ... আর ভালো লাগছে না। তিন চার ঘন্টার মধ্যে ঘেস গ্রাম পৌঁছে যাবো। আবার সেই মানুষ... আবার গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ... ছবি তুলতে গেলে ফ্রেমের মাঝখান দিয়ে বৈদ্যুতিক তার... ইশ। পুরো মজাটাই বারোটা বেজে যাবে। কিন্তু আসল মজাটা হল যে এই কদিনের স্মৃতি নিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেব।

হিমালয় আর কাউকে কি দিয়েছে জানিনা, আমায় কিন্তু পাহাড়কে ভালবাসা বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে আর সঙ্গে দিয়েছে যারপরনাই মধুর স্মৃতি যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে।

পুরো পিনিক খেয়ে লিখে ফেলছি। ছবির সাথে জায়গার বর্ননা থাকলে ছবিটার দেখার মধ্যে অনেক উপলব্ধি পাওয়া যায়।

"বারিশ আনেবালী হৈঁ ভৈয়া, থোড়া দের রুক জাইয়ে মেরে ঘর মে। চায় পী কর ফির চেলে জানা"

বৃষ্টিটা তখন সবে শুরু হয়েছে, সেরকম গায়েও লাগছেনা। বাগজি বুগিয়াল থেকে নামার সময় জঙ্গল পেরিয়ে এসে প্রথম যে ঘরটা দেখতে পেয়েছিলাম, সেটাই সবে পেরিয়েছি। এমন সময় পেছন থেকে কথাগুলো ভেসে এলো। ঘরের দরজাটা সামনের দিকে তাই খেয়ালও করিনি যে ওখানে গৃহস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। আওয়াজ শুনে

ঘুরে তাকাতেই রবিঠাকুরের গানের কলি কানে বেজে উঠল "এসো এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে..."

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে আমাদের ডাকছেন। কি অসম্ভব দুর্দান্ত অভ্যর্থনা। শহরে বৃষ্টিতে কোনো বাড়ির বারান্দার তলায় একটু দাঁড়ালে জানলা দিয়ে কুটুক্তি ভেসে আসে - "দরজাটা ছেড়ে দাঁড়ান, ওখান দিয়ে লোক যাতায়াত করে... ইয়্যাদি ইত্যাদি" আর আমাদের পাহাড়ের মানুষ বৃষ্টি হচ্ছে বলে ঘরের ভিতরে ডাকছেন। আবার চাও খাওয়াবেন বলছেন। সহজ সরল জীবনযাপন, হয়তো নিজেরাও দুবেলা ভালো ভাবে খাওয়াদাওয়া করে উঠতে পারেন না তবুও আমরা যে সারাদিন ধরে ওপর থেকে হেঁটে আসছি সেই উপলব্ধিটাই অসামান্য।

আমরা অবশ্য ওনার কাছে চা আর খাইনি। ওনার আমন্ত্রণে সারা দিয়ে এক গ্লাস করে জল খেয়ে ওনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এগিয়ে গেলাম কারণ আমাদের আগে যেতে হবে জয়বীরের বাড়ি, আমাদের এই পথের পথনির্দেশক, যে আমাদের কাছে দেবতার রূপ। জয়বীরের বাড়ি আরো কিছুটা দূরে। বৃষ্টি হওয়াতে চাষের খেতগুলো যেন আরো সবুজ হয়ে উঠেছে আর তারই মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছুটা করে অংশ রামদানার চাষ হয়ে রয়েছে। তাই সমস্ত উপত্যকাটাই মনে হচ্ছে লাল আর সুবুজের আল্পনা আঁকা। বৃষ্টির মধ্যেই বাচ্চাগুলো খেলে চলেছে। এই সব দেখতে দেখতে বেশ জোরে নামলো বৃষ্টি। আর নতুন করে water proof বের না করে শেষে ভিজতে ভিজতেই পৌছে গেলাম জয়বীরের বাড়ি। ঠিক পাহাড়ে যেরকম বাড়ির ছবি তুলি একদম সেরকম। টুকরো টুকরো পাথর দিয়ে তৈরি দেয়াল, স্লেটের মতো পাথর দিয়ে ছাদ আর

মেজে। বৃষ্টিতে ভিজে অসম্ভব ঠান্ডা লাগছিলো। জয়বীরের দুজন লোক আগে পৌঁছে ঘরে খবর দিয়ে রেখেছিল তাই চা টা তৈরিই ছিল।

গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে খোশমেজাজে কিছুক্ষন গল্প হল। গত কয়েকদিনের একসাথে থাকার বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর মুহূর্তের কথাই হচ্ছিল।

বৃষ্টি থামতে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ি রাস্তায় পৌঁছতে লাগল আর মিনিট কুড়ি।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবার ফেরার পালা। গাড়িতে ওঠার আগে জয়বীরদের জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া আর কিছুই তো করতে পারিনা। যেটা পারিশ্রমিক হিসেবে ওদের দিই সেটার তুলনায় শতগুন বেশি আমাদের দেয় ওরা। তাই ছেড়ে আসার সময় সত্যিই কষ্ট হয় আর সেই কষ্টটা আসে আবেগ থেকে। আর আবেগটা আছে বলেই হয়তো এখনো নিজেকে মানুষ বলে মনে হয় আর জয়বীর রা আছে বলেই আমরা হিমালয়কে সত্যিইকারের ভালবাসতে শিখেছি।